বিবেকানন্দ
জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিবেকানন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কিশোর ভারতী

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

প্রচ্ছদ :
শ্রীহরেন চক্রবর্তী
ভিতরের ছবি :
শ্রীমানস ভট্টাচার্য
মুদ্রাপক :
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬
প্রকাশক :
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
৯, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট ;
কলিকাতা-৯

কিশোর ভারতী
প্রথম সংস্করণ
মূল্য : চৌদ্দ আনা

প্রাপ্তিস্থান :
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ;
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৪ কলেজ স্কোয়ার ;
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ;
কলিকাতা

বিবেকানন্দ

ভুবনেশ্বরী দেবী উপবাস করে দেবাদি-দেব মহাদেবের শরণ নিয়েছেন, সারাটি দিন শুধুই কামনা করেছেন—হে বাবা বিশ্বনাথ, আমার একটি পুত্র-সন্তান দাও!

কাশীতে এক আত্মীয়া আছেন, তাঁকে চিঠি লিখেছেন—আজ আমার কামনা বাবা বিশ্বনাথের চরণে নিবেদন করবেন!

সেই রাত্রে ভুবনেশ্বরী দেবী স্বপ্ন দেখলেন—মহাদেব এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে,—জ্যোতির্ময় দিব্য কান্তি, নয়নে অপার করুণা। ভুবনেশ্বরী দেবীর মুখের

পানে তাকিয়ে সহসা তিনি রূপ বদলালেন—এক শিশুর মূর্তি। শিশুটি আশ্রয় নিল ভুবনেশ্বরীর কোলে। ভুবনেশ্বরী দেবীর সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠলো, তন্দ্রা ভেঙে গেল। ভক্তিভরে তিনি প্রণাম জানালেন দেবাদিদেবের উদ্দেশে।

স্বপ্ন সত্য হোল বছর খানেক পরে। পৌষ সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা ভুবনেশ্বরী দেবীর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হোল। পর পর দুটি মেয়ের পর এই প্রথম ছেলে,—সারা গৃহে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতার নাম-করা আইনজীবী। প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনে সমারোহ বড় কম হোল না। শিশুর নাম রাখা হোল নরেন্দ্রনাথ।

ভুবনেশ্বরী দেবী কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখার কথা মনে করে ছেলের নাম রাখলেন—বীরেশ্বর। কিন্তু অত বড় নাম সব সময় বলা চলে না। তা'ই সংক্ষেপে হোল—বিলে।

বাড়ীর একটি মাত্র ছেলে—আদুরে ছেলে।

আদুরে নরেনের দুষ্টামির আর শেষ নাই। কোন কথা শুনবে না, কোন ধমক মানবে না, কোন আদরে ভুলবে না, যা বায়না ধরবে তাই তার চাই, না হলেই চীৎকারে বাড়ী মাথায় করে তুলবে ?

মা শেষে বিরক্ত হয়ে বলতেন—মহাদেব নিজে না এসে কোত্থেকে একটা ভূত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তারপর পুত্রকে বলতেন—দেখ্ বিলে, অমন ধারা দুষ্টুমি করলে, মহাদেব তোকে আর কৈলাশে ঢুকতে দেবেন না।

এক অজানা আশঙ্কায় বালকের চোখের পাতা কেঁপে ওঠে, মায়ের মুখে কৈলাশের কথা সে অনেক শুনেছে। কৈলাশে যাবার আগ্রহ তার খুব বেশী, সে-ই কৈলাশেই সে ঢুকতে পাবে না ! বালক তখনই শান্ত হয়।

কিন্তু অনেক সময় রাগ যখন খুব বেড়ে যায়, তখন আর কৈলাশের কথা মনে থাকে না, বালকের চীৎকার আর থামে না।

মা তখন এক ঘটি জল এনে ছেলের মাথায় ঢেলে দেন, বলেন—শিব! শিব!

মুহূর্তমধ্যে বালকের সব রাগ শান্ত হয়ে যায়।

শিবের উপর বালকের অসীম ভক্তি। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই সেই ভক্তির ভাবটুকু মনের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, পরণের কাপড়খানি ছিঁড়ে কৌপীন করে পরে সন্ন্যাসী সাজে, তারপর উঠানে নাচে, তালি দেয় আর বলে—শিব! শিব!

কেবল শিব ঠাকুরই নয়, সীতারামের সঙ্গেও বালকের পরিচয় মায়ের কোল থেকেই।

বাড়ীতে মেয়ে-মহলে দুপুর বেলা এক বৃদ্ধা রামায়ণ পাঠ করতেন, বিলে মায়ের কোলে বসে শুনতো। কখন-কখন মা নিজেও পড়তেন। বালক রামসীতার ছবি দেখতো মানস-চোখে।

সীতারাম ঠাকুর। দশমাথা-ওয়ালা রাবণকে তিনি যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়েছিলেন। বিলে সীতারামের ভক্ত হয়ে ওঠে। এই ভক্তি আরো জোরালো করে তোলে বাড়ীর এক হিন্দুস্থানী কোচ্‌ম্যান।

এই কোচম্যান্‌টি ছিল বালকের চোখে মস্ত এক বীর পুরুষ। কেমন সে গাড়ীর ছাদে বসে, অমন ছুটন্ত তেজী ঘোড়াটিকে সামান্য দুটি রাশ ধরে দিব্যি রাজপথে ছুটিয়ে বেড়ায়।

সেই জন্য কোচ্‌ম্যানের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব সব চেয়ে বেশী।

বাবা একদিন জিজ্ঞাসা করেন—বিলে, তুই বড় হলে কি হবি, বল্‌ দিকি ?

বিলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—ঘোড়ার সহিস কি কোচম্যান হব।

এই কোচ্‌ম্যান ছিল হিন্দুস্থানী, সীতারামের ভক্ত। তার সীতারামের পূজা দেখে বালক ঠিক করলো সে-ও সীতারামের পূজা করবে। একদিন নরেন বাজার থেকে সীতারামের একটি মূর্তি কিনে আনলো। ছাদের ঘরটি ছিল বালকের খেলা-ঘর। সেখানে সীতারামের মূর্তিটি রেখে রোজ রীতিমত পূজা করা সুরু হোল। কোচম্যানকে বললো—আমিও রোজ সীতারামের পূজা করি।

এবার দু'জনে মনের মিল হোল আরও বেশী।

কিন্তু সীতারামের পূজা বেশীদিন চললো না। একদিন কথায় কথায় কোচম্যান বললো—খোকাবাবু, বিয়ে করা ভারী খারাপ, বউ খালি ঝগড়া করে, বাড়ীতে একটুও শান্তি পাই না।

স্ত্রীর সঙ্গে কোচম্যানের বনতো না, স্ত্রীর বদমেজাজের কথা কোচম্যান বালকের কাছে গল্প করলো। বালক সব শুনলো, বসে বসে ভাবলো, তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বললো—মা, আমি সীতারামের পূজা কেমন করে করবো, সীতারামের বউ ছিল যে!

মা হেসে বললেন—সীতারামের পূজা নাই করলে, কাল থেকে তুমি শিব পূজা করো!

বালকের সমস্যা মিটে গেল। পূজা তো রোজ করতে হবে, নরেন সীতারামকে ছেড়ে শিবের পূজা সুরু করবে।

বালক তখনই ছাদে এসে সীতারামের মূর্তিটিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পরদিনেই সীতারামের স্থলে বসলো এক শিবমূর্তি।

কিন্তু শুধু পূজা করে নরেনের তৃপ্তি হয় না, ঠাকুরের সামনে সে ধ্যান করতে বসে, তা'ও আবার একা নয়, কয়েকজন খেলার সাথীকেও সে জোগাড় করে নেয়। সবাই এক সঙ্গে চোখ বুঁজে বসে থাকে শিবমূর্তির সামনে।

একদিন সকলে মিলে ধ্যানে বসেছে। এক একজন এক একবার চোখ মেলে দেখছে, বিলে চোখ খুলেছে কি না, বিলে না উঠলে কারও ওঠার হুকুম নেই।

হঠাৎ একটি ছেলে চীৎকার করে উঠলো—সাপ! সাপ!

আতঙ্কে সব ছেলে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের চেঁচামেচিতে বাড়ীর মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—ছাদের ঘরে সাপ!

মা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলেন, ঘরের মধ্যে তাকিয়েই মায়ের বুক ত্রাসে দুড়দুড় করে উঠলো: বিলে শিবমূর্তির সামনে চোখ বুঁজে ধ্যানে বসে আছে, আর তার সামনে এক বিষধর সাপ ফণা দোলাচ্ছে।

মা কি করবেন ভেবে পেলেন না, সাপ তাড়াতে গেলে যদি বিলেকে ছোবল মারে!

এমন সময় পিছনে আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সাড়া পেয়ে সাপটি ফণা গুটিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। সবাই হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকলো, কিন্তু সাপটির কোন উদ্দেশ করা গেল না।

তখন নরেনেরও ধ্যান ভাঙলো, হৈ চৈ দেখে সে তো অবাক, বললো—সাপ! কই, সাপের কথা আমি তো কিছুই জানি না, চোখ বুঁজে বসে থাকতে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছিল।

চোখ বুঁজে ধ্যানে বসলে যে নরেনের আর জ্ঞান থাকে না, মা পরেও তা দেখেছেন, বহুবার ছেলের গায়ে হাত দিয়ে ডেকেও অনেক সময় সাড়া পান নি।

সীতারামের পূজা ছাড়লেও, রামায়ণের আকর্ষণ বালকের মনে সমভাবেই ছিল। কাছাকাছি এক বাড়ীতে কথকতা হচ্ছিল, নরেন গিয়েছিল শুনতে।

কথক-ঠাকুর সেদিন রামভক্ত হনুমানের গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন—হনুমান অমর, এখনও বেঁচে আছেন।

কথকতা শেষে বালক কথক-ঠাকুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি বললেন হনুমান এখনও বেঁচে আছেন, হনুমান কলা খেতে ভাল বাসেন, কলা-বাগানে থাকেন, আমি কলাবাগানে গেলে হনুমানের দেখা পাব ?

কথক-ঠাকুর হেসে বললেন—হ্যাঁ, খোকা, তুমি কলাবাগানে খুঁজলেই তাঁকে দেখতে পাবে।

নরেন তখনই ছুটলো এক বাগানে। বাগানটি তাদের বাড়ীর পাশেই। বাগানে অনেক কলা গাছ। সেই গাছগুলির কাছে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বসে আছে তো বসেই আছে। রাত বাড়ছে। চারিপাশ স্তব্ধ, নিঝুম, কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। বালকের মনে কিন্তু এতটুকু ভয় নেই। হনুমানকে সে দেখতে এসেছে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে বালক ক্লান্ত হয়ে পড়লো। হনুমান এলেন না দেখে মনে বড় দুঃখ হোল। দুপুর রাতে বাড়ী ফিরে এসে বললো—মা, হনুমান তো এলেন না !

মা চিন্তা করছিলেন, বিলে এতো রাতে কোথায়

গেল। এখন ছেলের মুখ থেকে সব শুনে ব্যাপার বুঝতে পারলেন। পুত্রের সরল বিশ্বাসে কিন্তু তিনি আঘাত দিলেন না, বললেন—আজ হয়তো হনুমান রামের কাজে অন্য কোথাও গেছেন, আর একদিন দেখা হবে!

বালক নরেন্দ্রনাথের লেখা পড়া সুরু হয় মেট্রোপলিটান ইস্কুলে। ঠাকুরের মূর্তির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে ধ্যান করলেও, ইস্কুলে বেলা সাড়ে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকা তার পক্ষে বেজায় কষ্টকর হয়ে উঠলো। স্বভাব বড় চঞ্চল। বসে থাকতে থাকতে এক এক সময় সহসা দাঁড়িয়ে উঠতো। আবার কোন সময় হয়তো কাউকে কিছু না বলে দৌড়ে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেত। যখন নেহাৎ চুপ করে বসে থাকতেই হবে, তখন বালক পরণের কাপড় কি পড়ার বই ছিড়তে সুরু করতো।

এতো চঞ্চল হলেও ছাত্র হিসাবে নরেন খারাপ ছিল না, খুব তাড়াতাড়ি সে পড়া তৈরী করতে পারতো।

পড়া তৈরী হলেই বাকী সময়টা ছুটি। ছুটি মানে, হুড়োহুড়ি আর খেলাধূলা।

পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের দলপতি ছিল নরেন। তা দলপতি হবার মত শক্তি ও সাহস তার ছিল। তার ঘুসির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন সমবয়সী ছেলে পাড়ায় কেউ ছিল না। সহজে ভয় পাবার মত ছেলেও তিনি ছিলেন না।

একবার পাড়ার এক বাড়ীর কর্তা তাদের ভূতের ভয় দেখিয়েছিলেন। ছেলের দল তাঁর চাঁপা ফুলের গাছে উঠে ডালে পা আট্‌কে মাথাটা নীচের দিকে করে ঝুলে থাকে। কখন কে গাছ থেকে পড়ে হাত পা ভাঙ্গবে কে জানে! বুড়ো-কর্তা ছেলেদের ভয় দেখিয়ে বললেন—ওরে, ওই গাছে তোরা উঠিস নে, ওতে যে ব্রহ্মদৈত্য থাকে তা জানিস্। শিগ্‌গীর পালা, এখনি তোদের ঘাড় মটকাবে!

ব্রহ্মদৈত্য! সর্বনাশ! ছেলেরা সব দৌড় দিল, নরেন কিন্তু নড়লো না, বললো—ধেৎ, তোরা ভারী ভীতু! ব্রহ্মদৈত্য আছে তো এতক্ষণ আমাদের ঘাড় মটকালে না কেন? বুড়ো-কর্তা বললো আর তোরা ভয়ে পালালি।

সত্যিই তো! ছেলেরা আবার ফিরে এলো গাছ তলায়, আবার সুরু হোল গাছে চড়া।

ছেলের দল নৌকা করে চলেছে শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে।

চাঁদপাল ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে একটি ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো—বমি করে ফেললো নৌকার মধ্যেই। মাঝি তো রেগেই আগুন, বললো—নৌকা সাফ করে দাও!

ছেলেরা বললো—নৌকা তীরে ভেড়াও, মেথর দিয়ে সাফ করিয়ে দিচ্ছি!

মাঝি কিন্তু নৌকা তীরে ভিড়াতে চাইল না, বরং মার-ধর করবে বলে ভয় দেখালো।

ছেলেরা কি করবে ভেবে পেল না।

নরেন ছিল ছেলেদের মধ্যে, হঠাৎ তার চোখে পড়লো দু'জন গোরা সৈন্য গঙ্গার তীরে পায়চারি করছে। তখনই তার মাথায় একটা ফন্দি এসে গেল। নৌকা তীরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল! এক লাফে নৌকা থেকে নেমে সে দৌড়ে গেল সৈনিক দু'জনের কাছে। অনেক দিনের পরিচিতের মত দু'জনকে দু'হাতে ধরে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে তাদের বোঝাতে সুরু করলো নিজেদের কথা। গোরা দু'জন বালকের সঙ্গে এলো নৌকার কাছে। মাঝি ব্যাপার দেখে প্রথমে একটু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, এখন একেবারে জল হয়ে গেল। ছেলেদের আর একটি কথাও বললো না, তারা সবাই তীরে গিয়ে নামলো।

এমন ছেলে সহজেই দলের সর্দার হয়, নরেনও সমবয়সীদের দলপতি ছিলেন।

কলকাতায় এক যুদ্ধের জাহাজ এলো।

যুদ্ধের জাহাজ দেখবার জন্য জাহাজ ঘাটে ভীড় জমলো। কিন্তু ক্যাপ্‌টেনের অনুমতি-পত্র না পেলে জাহাজ দেখতে পাওয়া যাবে না।

ক্যাপটেন সাহেব থাকেন চৌরঙ্গীর এক বাড়ীর তিনতলায়। দরজাতে কড়া পুলিশ পাহারা, সহজে কেউ ভেতরে যেতে পারে না। তাহলে কি ছেলেদের জাহাজ দেখা হবে না ? ছেলেরা এসে ধরলো নরেনকে।

নরেন এলো ক্যাপ্‌টেনের বাড়ীর ফটকে। পুলিশ তাদের সেখানে দাঁড়াতে দিল না। একটু তফাতে এসে নরেন দেখতে লাগলো—তিনতলায় একটি ঘরে সবাই আবেদন-পত্র হাতে নিয়ে ঢুকছে আর বেরিয়ে আসছে। ওই ঘরেই ক্যাপটেন আছে। ঘরখানির পিছন দিক থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে নীচে, সেই সিঁড়ি দিয়ে খানসামা, বেহারা প্রভৃতি ওঠা-নামা করছে।

নরেন আর অপেক্ষা করলো না, পুলিশকে পাশ কাটিয়ে সেই ছোট সিঁড়ি দিয়ে বরাবর উঠে গেল সাহেবের ঘরে। সাহেব বসে বসে তখন দরখাস্ত সই করছিল। নরেন কাগজখানি তার সামনে ধরতেই সাহেব সেখানিও সই করে দিল। নরেন এবার সামনের বড় সিঁড়ি দিয়ে বুক ফুলিয়ে নেমে এলো। পুলিশরা তো অবাক।

কাপড় না পেলে তিনি অনশন করে দেহত্যাগ করবেন, লোক চক্ষুর সামনে আর আসবেন না।

বনের মধ্য দিয়ে স্বামীজী চলেছেন। হঠাৎ দেখেন একটি লোক ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই আসছে। স্বামীজী থমকে দাঁড়ালেন। লোকটি এসে তাঁকে একখানি নূতন কাপড় ও কিছু খাবার দিল।

লোকটি অপরিচিত। স্বামীজী কিছু বলার আগেই লোকটি ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বামীজী সেই কাপড়খানি পরে আবার লোকালয়ে ফিরে এলেন।

আলমোড়ায় স্বামীজীর ডিপ্থিরিয়া হয়।

এই অসুখ বয়স্কদের হলে সারানো কঠিন হয়। অল্প কয়েকদিনের মধেই স্বামীজীর রোগ এমনই হয়ে ওঠে, যে সকলে জীবনের আশা ছেড়ে দেন।

জীবন-দীপ যখন প্রায় নিভে আসছে, এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে পড়লেন। স্বামীজীর অবস্থা দেখে একটি ওষুধ খাইয়ে চলে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীজীর অবস্থা ফিরে গেল, স্বামীজী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আলোয়াড়ে স্বামীজীকে একজন প্রশ্ন করেন —আপনি গেরুয়া পরেছেন কেন ?

স্বামীজী উত্তর দেন—ভদ্রবেশে ঘুরলে ভিক্ষুকেরা আমার কাছে ভিক্ষা চাইবে, কিন্তু এ বেশে তারা

জানবে আমিই ভিখারী। কেউ কিছু চাইলে না দিতে পারলে মনে বড় দুঃখ পাই, তাই আমার এই বেশ।

আলোয়াড়ের মহারাজা স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করেন। রাজসভার মাঝে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি ইচ্ছা করলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তাহলে ভিক্ষা করেন কেন?

স্বামীজী তার উত্তরে বললেন—আপনি রাজ-কাজে অবহেলা করে সাহেবদের সঙ্গে মৃগয়া ও আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করেন কেন?

রাজা বললেন—আমার ভাল লাগে।

স্বামীজী বললেন—ফকিরের বেশে ঘুরতে আমারও ভাল লাগে।

রাজা বললেন—দেখুন স্বামীজী, মূর্তি পূজায় আমার বিশ্বাস নেই, আমি কাঠ মাটি পাথরের মূর্তি-গুলিকে ভক্তি করতে পারি না।

স্বামীজী তখনই সেকথার কোন উত্তর দিলেন না, দেয়ালে মহারাজার একখানি ছবি টাঙানো ছিল, বললেন—ছবিখানি তো বেশ, নামান তো দেখি!

ছবিখানি নামানো হোল।

স্বামীজী ছবিখানি রেখে বললেন—দেওয়ানজী, এই ছবিখানিতে থুতু ফেলুন তো?

স্বামীজীর কথা শুনে সভার সকলেই স্তব্ধ।

ছেলেরা বাইরে দাঁড়িয়েছিল, এবার সবাই মিলে হৈ চৈ করতে করতে চলে গেল যুদ্ধ জাহাজ দেখতে।

আরেকবারের কথা।—

চড়কের মেলা দেখে ছেলের দল ফিরছে।

পথ পার হবার সময় হঠাৎ চারিপাশে সাড়া পড়ে গেল—গেল! গেল!

একটি ছোট ছেলে সবাইকার পিছনে পড়ে গিয়েছিল, একখানি গাড়ী এসে পড়েছে একেবারে তার ঘাড়ের উপর।
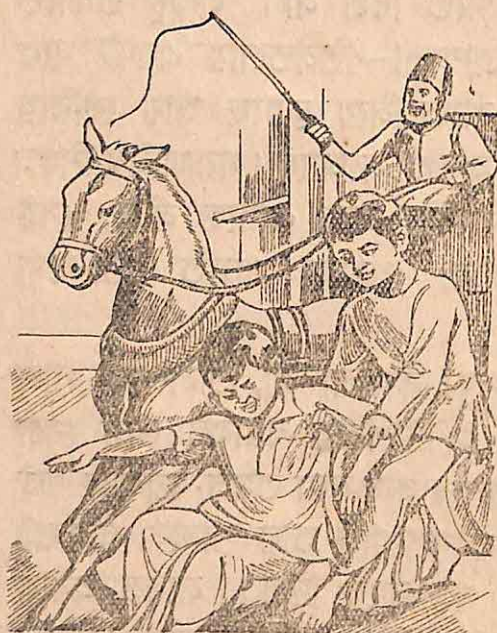
নরেনও ছিল সেই ছেলের দলে, একটি শিবমূর্তি কিনে সে ফিরছিল। চীৎকার শুনে ফিরে তাকিয়েই সে ব্যাপার বুঝতে পারলো, তীরের মত ছুটে গিয়ে বালকটির হাত ধরে সে টেনে আনলো। আর এতটুকু দেরী হলেই বালকটি ঘোড়ার পায়ের নীচে থেঁৎলে যেত!

পথিকেরা তো অবাক্, তারা যা সাহস পায়নি, ছ'-সাত বছরের একটি ছেলে তা সম্ভব করলো। আনন্দে নরেনকে তারা আশীর্বাদ করলো।

বাড়ী ফিরে এসে পাড়ার ছেলেরা ভুবনেশ্বরী দেবীকে সব কথা বললো, মা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সজল চোখে বললেন—সব সময় এম্‌নি মানুষের মত কাজ করিস্ বাবা !

মায়ের এই আশীর্বাদের সঙ্গে আরেকজনের ভবিষ্যৎ-বাণী যুক্ত হয়েছিল, তিনি ঠাকুরদার ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত।

বৃদ্ধ কালীপ্রসাদ মৃত্যুকালে বুঝতে পেরে, বাড়ীর আত্মীয়-পরিজন সকলকে কাছে ডাকলেন, নরেন ও তাঁর বোনকে বললেন—আমাকে একটু মহাভারত পড়ে শোনাও দিকি !

ভাই-বোনে মহাভারত পড়তে সুরু করলেন। বৃদ্ধ শুনতে লাগলেন।

মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে মুমূর্ষু বৃদ্ধ চোখ মেললেন, নরেনের মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—বালক, তোমার ভবিষ্যৎ মহিমামণ্ডিত।

এই ভবিষ্যৎ-বাণী কালে বালকের জীবনে সার্থক হয়ে উঠেছিল।

বিশ্বনাথবাবু ছিলেন উকিল। এক পেশোয়ারী মক্কেল আসতো তাঁর কাছে। দেশ-বিদেশের নানা গল্প বলতো। আফগানিস্তান থেকে বাংলা দেশ অবধি সে ঘুরেছে,—কখনো হাতীর পিঠে চড়েছে, কখনো-বা চলেছে উটের পিঠে! বালক নরেন্দ্রনাথ বসে বসে নিবিষ্ট মনে সেই সব গল্প শুনতো আর মাঝে মাঝে বলতো—আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন সেই সব দেশে?

পেশোয়ারী হেসে বলতো—তুমি নেহাৎ ছেলে-মানুষ, আরেকটু বড় হও, তারপর।

—কত বড় হলে নিয়ে যাবেন?

—আর, দু' আঙুল বড় হলেই নিয়ে যাব!

বালক পরদিন সকালে এসেই বলতো—দেখুন, আজ আমি ঠিক কালকের চেয়ে দু' আঙুল বেড়ে গেছি।

পেশোয়ারী হাসতো।

নরেনকে সে খুব ভালবাসতো, ফল ও সন্দেশ নিয়ে আসতো তার জন্য। বালক বিনা দ্বিধায় সেই সব গলাধঃকরণ করতো।

বাড়ীতে মেয়ে-মহলে এই নিয়ে অনেক কথা উঠতো—মুসলমানের হাত থেকে খাবার খাওয়া!

বিশ্বনাথবাবু ছিলেন সংস্কারমুক্ত মানুষ, তিনি শুনে শুধু হাসতেন, পুত্রকে কিছুই বলতেন না।

বালক শুনতো আর ভাবতো—মুসলমানের দেওয়া সন্দেশ খেলে কি দোষ হয় ?

পিতার বৈঠকখানার একধারে পাশাপাশি সব হুঁকা সাজানো থাকতো—এক এক জাতের জন্য এক একটি হুঁকা। বালক শুনতো যে ছোট জাতের এঁটো খেলে নাকি জাত যায়, তাই উঁচু জাতের আর নীচু জাতের হুঁকা আলাদা !

একদিন সাহস করে নরেন সব ক'টি হুঁকায় মুখ দিয়ে দেখতে লাগলো। আশ্চর্য ! ছোট জাতের এঁটো হুকায় মুখ দিয়েও তো কই তার কিছু হোল না। তাহলে ?

বাবা কোন এক সময় ঘরে ঢুকে ছেলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কি করছিস্ রে, বিলে ?

নরেন জবাব দিল —দেখলাম, আমার জাত যায় কি না।

বালক এবার প্রত্যেকটি সংস্কার ও রীতিকে যাচাই করতে সুরু করলো :

—ভাতের থালা ছুঁয়ে গায়ে হাত দিলে দোষ হবে কেন ?—হাতে তো এঁটো লাগেনি !

—খাবার সময় বাঁ হাতে করে গেলাস তুলে জল খেলে হাত ধুতে হবে কেন ?—হাতে তো এঁটো লাগেনি !

মায়ের পক্ষে এই সব কথার সদুত্তর দেওয়া সহজ নয়। বালক তা'তে সাহস পায়, চিরাচরিত রীতি ও আচারকে সহজে গ্রাহ্য করতে চায় না।

পড়ার দিকে নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল ! ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তক যা পড়তেন তার চেয়ে অনেক বেশী পড়তেন বাইরের বই।

বিশ্বনাথবাবু এ বিষয়ে ছেলেকে খুব উৎসাহ দিতেন।

বিশ্বনাথবাবু এক মক্কেলের কাজে দু'বছর রায়-পুরে ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেই দু' বছর পিতার কাছেই পড়াশুনা করেন। নানা অসুখে ভুগে শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল, হাওয়া বদলাতে পুত্র রায়পুরে যান পিতার কাছে। পিতা পুত্রকে মনের মত করে শিক্ষা দিতে সুরু করলেন।

এই শিক্ষা শুধু পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, ছিল সর্বতোমুখী।—আলাপ-আলোচনায় ও কাজে। বাংলা ভাষায় ভালো বই যা ছিল সবই এই সময় নরেন পড়ে শেষ করেছিল। সেই সব প্রসঙ্গে পিতা-পুত্রে

আলোচনা হোত! একদিন এক সাহিত্যিক-বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বনাথবাবু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করছেন, নরেন কাছে বসে শুনতে শুনতে হঠাৎ দু'-একটি কথা বলে ফেললেন। পিতৃবন্ধু পনেরো বছরের বালকের বিচার বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলেন, বললেন —তোমার যা প্রতিভা দেখছি, একদিন তুমিই বাংলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করবে।

সাহিত্যের যারা ভক্ত অঙ্ক তাদের ভালো লাগে না। নরেন্দ্রনাথ অঙ্কে কাঁচা ছিলেন। কেউ আবার সে কথা বললে, তিনি বলতেন—ওতো দোকানদারের জুয়াচুরী বিদ্যা, ওতে আমার দরকার নেই।

নরেন রায়পুরে পিতার কাছে দু' বছর ছিলেন। এখানে তিনি পিতার কাছে ভালো ভাবে রাঁধতেও শিখেছিলেন। এখানে থেকে শরীরটাকে এমন মজবুত করে বেঁধে নিয়েছিলেন যে, পরে কলিকাতার এক বক্সিং খেলায় জিতে তিনি একটি রূপার প্রজাপতি উপহার পেয়েছিলেন।

দু'বছর পরে নরেন কলিকাতায় ফিরলেন।

দু' বছর ইস্কুলে অনুপস্থিত।

শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে তবে তাঁকে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্তি করতে পারেন।

পরের বছর নরেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস

এফ-এ পরীক্ষা, পড়ার চাপে পরমহংসদেবের কথা তিনি প্রায় ভুলেই গেলেন।

এফ-এ পরীক্ষা দেবার পর কন্যাপক্ষ এসে ধরলেন বিশ্বনাথবাবুকে—ছেলের বিয়ে দিন, নগদ দশ হাজার টাকা যৌতুক দোব।

দশ হাজার টাকা!

আত্মীয়েরা ধরে পড়লো—নরেন বিয়ে কর!

নরেন বললেন—বিয়ে করার ইচ্ছা আমার নেই।

আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত একদিন বললেন—তুমি বিয়ে করবে না কেন?

নরেন বললেন—আমি আগে সত্যকে উপলব্ধি করতে চাই।

—যদি তাই তোমার অভিপ্রায় হয় তাহলে ব্রাহ্ম সমাজে না গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে চল।

রামচন্দ্রের সঙ্গে একদিন নরেন গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। একা নয়, ক'জন বন্ধুও সঙ্গে চললো।

নরেনকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই তো গানের ফরমাস দিলেন। তারপর গান শেষ হতেই নরেনের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বাহিরে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে বললেন—হাঁরে, তুই এতদিন কেমন করে আমায় ভুলে ছিলি? তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথপানে চেয়ে বসে আছি।

বলতে বলতে পরমহংসদেব কেঁদে ফেললেন, সহসা হাত জোড় করে বললেন—আমি জানি তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি—নররূপী নারায়ণ; জীবের কল্যাণ কামনায় দেহধারণ করেছ!

নরেন তো অবাক, মানুষটি পাগল নাকি, তাকে এ সব কি বলছে!

ঠাকুর ঘরে ফিরে এলেন, কাছে বসে নরেন অনেকক্ষণ ঠাকুরের হাবভাব দেখলেন, মানুষটির মধ্যে কোন পাগলামি দেখতে পেলেন না। তাহলে?

চিন্তাকুল মনে নরেন বাড়ী ফিরলেন।

সেই থেকে নরেনের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত সুরু হোল।

একদিন কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা দেখা করে চলে গেলেন। নরেন একপাশে বসে ছিলেন। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন—ভেবে দেখলাম, কেশব যে শক্তির বলে খ্যাতিলাভ করেছে নরেনের মধ্যে অমন আঠারোটা শক্তি আছে। কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে, নরেনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞান সূর্য।

—বলেন কি মশাই!—নরেন প্রতিবাদ তুললেন—কোথায় জগৎ-বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায়

করলেন। সেই ইস্কুল থেকে সেই বছর তিনিই শুধু প্রথম বিভাগে পাস করেন।

ইস্কুলের সব-সেরা ছেলে। বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁর ডাক পড়লো—একজন শিক্ষক বিদায় নিচ্ছেন, ছাত্রদের পক্ষ থেকে নরেনকেই কিছু বলতে হবে।

সভা বসলো। সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনে বসে আছেন যত জ্ঞানী গুণী শিক্ষক ও অভিভাবকেরা। সেখানে ষোলো বছরের ছেলের পক্ষে দাঁড়িয়ে উঠে কথা বলা সহজ ব্যাপার নয়। নরেনের কাছেও তা সহজ হয়নি, কিন্তু বক্তৃতা তিনি দিলেন—ইংরাজী বক্তৃতা, তা'ও আবার দু'চার মিনিট নয়, প্রায় আধঘণ্টা।

বক্তৃতা শুনে সুরেন্দ্রনাথ খুসি হয়েছিলেন, তরুণ বক্তার প্রশংসাও তিনি করলেন।

নরেন্দ্রনাথের জীবনে সেই প্রথম বক্তৃতা।

নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু এমন ম্যালেরিয়া হোল যে পড়াশুনা তাঁকে বন্ধ রাখতে হোল পুরা একটি বছর।

পরের বছর তিনি ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে।

সাহিত্য শেষ করে এবার সুরু হোল দর্শনশাস্ত্র পড়া।

ব্রাহ্ম সমাজ তখন সারা দেশের বুকে সাড়া তুলেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তত্ত্বালোচনা তখন শিক্ষিতদের মুগ্ধ করেছে। নূতন এক উদ্দীপনা জেগেছে বাংলার তরুণদের মনে। দলে দলে তারা এসে জমছে, ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-গৃহে। দর্শনের ছাত্র নরেন্দ্রনাথও ছিলেন এই তরুণদের একজন।

অল্প দিনের মধ্যেই নরেন সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। তিনি গান গাইতে পারতেন ভালো, রবিবারের উপাসনা সভায় তিনি গানও গাইতেন।

এই সময় পাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী থেকে একদিন ডাক পড়লো—দক্ষিণেশ্বর থেকে পরমহংস এসেছেন, তাঁকে গান শোনাতে হবে!

নরেন গেলেন সুরেন বাবুর বাড়ী, গান শোনালেন পরমহংসদেবকে। পরমহংসদেব ভারী খুসি হলেন, বললেন—তুই একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাস্!

দক্ষিণেশ্বরে নরেনের যাওয়া হোল না। সামনে

একটা কলেজের ছাত্র নরেন, লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বলবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন—তা কি করবো বল্, মা দেখিয়ে দিলেন তাই বলছি।

নরেন বললেন—মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল—কেমন করে বুঝবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন শুধু!

নরেনের মন সহসা অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠলো। চুপ করে আর থাকতে পারলেন না, একদিন বরাবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

মহর্ষি সহসা এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না, তবে নরেনকে শান্ত করার জন্য অনেক সদুপদেশ দিলেন।

নরেন কিন্তু শান্তি পেলেন না, পরদিনেই ছুটলেন —দক্ষিণেশ্বরে। সরাসরি পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন—আমি দেখেছি, তুমি দেখতে চাও তোমাকেও দেখাতে পারি!

নরেন স্তব্ধ বিস্ময়ে ঠাকুরের সামনে বসে পড়লেন।

শেষে সন্ধ্যাবেলা নরেনের মুখের পানে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, দক্ষিণ

পদ তুলে দিলেন নরেনের কাঁধের উপর। নরেন চমকে উঠলেন, তাঁর মনে হোল চারিপাশের সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কেবল তিনি একা! ভয়ে নরেন চীৎকার করে উঠলেন—ওগো, তুমি আমায় একি করছ, আমার যে বাপ-মা আছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বুকে হাত দিলেন, নরেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

নরেনের ধারণা হোল ঠাকুর তাঁকে সম্মোহিত করেছিলেন। এবার থেকে তিনি সাবধান হবেন।

কিন্তু ঠাকুরের কাছে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করতে পারলেন না। ঠাকুরকে তাঁর ভাল লাগে।

বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল।

একদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে গান বাজনার আসর জমিয়েছেন, এমন সময় একজন এসে খবর দিল—বিশ্বনাথবাবু হঠাৎ মারা গেছেন।

একটা কলেজের ছাত্র নরেন, লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বলবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন—তা কি করবো বল্, মা দেখিয়ে দিলেন তাই বলছি।

নরেন বললেন—মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার খেয়াল—কেমন করে বুঝবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন শুধু!

নরেনের মন সহসা অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠলো। চুপ করে আর থাকতে পারলেন না, একদিন বরাবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

মহর্ষি সহসা এ-কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না, তবে নরেনকে শান্ত করার জন্য অনেক সদুপদেশ দিলেন।

নরেন কিন্তু শান্তি পেলেন না, পরদিনেই ছুটলেন —দক্ষিণেশ্বরে। সরাসরি পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন—আমি দেখেছি, তুমি দেখতে চাও তোমাকেও দেখাতে পারি!

নরেন স্তব্ধ বিস্ময়ে ঠাকুরের সামনে বসে পড়লেন।

শেষে সন্ধ্যাবেলা নরেনের মুখের পানে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, দক্ষিণ

পদ তুলে দিলেন নরেনের কাঁধের উপর। নরেন চমকে উঠলেন, তাঁর মনে হোল চারিপাশের সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কেবল তিনি একা! ভয়ে নরেন চীৎকার করে উঠলেন—ওগো, তুমি আমায় একি করছ, আমার যে বাপ-মা আছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বুকে হাত দিলেন, নরেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

নরেনের ধারণা হোল ঠাকুর তাঁকে সম্মোহিত করেছিলেন। এবার থেকে তিনি সাবধান হবেন।

কিন্তু ঠাকুরের কাছে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করতে পারলেন না। ঠাকুরকে তাঁর ভাল লাগে।

বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল।

একদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে গান বাজনার আসর জমিয়েছেন, এমন সময় একজন এসে খবর দিল—বিশ্বনাথবাবু হঠাৎ মারা গেছেন।

নরেনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। পিতৃশোক ও অর্থাভাব। পিতা উপায় করতেন মাসে প্রায় হাজার টাকা, কিন্তু সঞ্চয় করে যেতে পারেননি এক পয়সাও। আত্মীয়-স্বজনের জন্য সব টাকাই তিনি খরচ করতেন।

নরেন চাকরীর চেষ্টা করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে চারমাস চলে গেল! অর্থাভাবে সবদিন আহার জোটে না, উপবাসে দিন কাটে।

এই সময় আবার এক জ্ঞাতি বাড়ী নিয়ে মামলা জুড়ে দিলে।

চারিদিক থেকে যখন এই অশান্তি, তখন মায়ের কথা একদিন তা' চরমে তুললো। সকাল বেলা নরেন ভগবানের নাম করছেন, এমন সময় মা বললেন—চুপ কর! ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান—ভগবান। ভগবান তোর সব করলেন!

কথাটা শুনে নরেনের ভারী কষ্ট হোল। সত্যই তো ভগবান কি তাদের দু'মুঠো অন্ন দিতে পারেন না?

পরমহংস দেবের কাছে গিয়ে বললেন—মশাই, যাতে আমার মা-ভাইবোনের দুটি খাবার জোগাড় হয় সে সম্পর্কে আপনার 'মা'কে অনুরোধ করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—ওরে, আমি কোনদিন মায়ের কাছ থেকে কিছু চাই না। তুই নিজে যা, আজ রাত্রে মাকে প্রণাম করে, তুই যা চাইবি, তাই পাবি।

সন্ধ্যা-আরতির পর নরেন প্রতিমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, প্রণাম করে বললেন—মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও !

বাহিরে আসতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাইলি ? মায়ের কাছে টাকা-পয়সা চাইগে যা ?

নরেন আবার মন্দিরে ঢুকলেন, কিন্তু সেবারও টাকা-পয়সার কথা তাঁর মুখ থেকে বেরুলো না।

বাহিরে আসতেই ঠাকুর বললেন—যা, যা, আবার যা !

নরেন আবার ভিতরে ঢুকলেন, কিন্তু টাকা-পয়সার কথা বলতে পারলেন না।

ঠাকুর হেসে বললেন—তুই নিজেই যখন চাইতে পারলি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই। তবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।

ঠাকুরের আশ্বাস পেয়ে নরেন অশ্বস্ত হলেন।

সত্যই দুর্যোগ কেটে গেল। বাড়ীর মামলায় নরেন্দ্রনাথ জিতলেন। এটর্ণী আপিসে একটা কাজ পেলেন। কয়েকখানি বইয়ের অনুবাদ করে কিছু টাকা পেলেন। শেষে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ইস্কুলে একটা মাষ্টারিও জুটে গেল।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্ষতরোগ দেখা দিল। কাশীপুরে একটি বাগান-বাড়ী ভাড়া নিয়ে শিষ্যেরা সেখানে পরমহংস দেবের থাকার ব্যবস্থা করলেন, সেবা-শুশ্রূষারও কোন ত্রুটি রাখলেন না।

নরেন একদিন গভীর রাত্রে পরমহংস দেবকে বললেন—আমি নির্বিকল্প সমাধি চাই!

নির্বিকল্প সমাধি যোগের পরম অবস্থা। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, শুধু থাকে আনন্দের অনুভূতি।

ঠাকুর বললেন—তোর লজ্জা করে না, শত শত লোককে শান্তি দিবি, তা না নিজের মুক্তির জন্য লালায়িত হয়েছিস্!

—সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—আচ্ছা যা, তোর সমাধি হবে।

সত্যই তারপর একদিন ধ্যান করতে করতে নরেন সমাধিস্থ হলেন।

এদিকে ঠাকুরের গলার ক্ষতরোগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো জীবনের আশা আর রইল না। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে ডেকে বললেন—নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রইল। তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, ওদের রক্ষা করিস, সৎপথে চালাস্,—আমি শীগ্‌গীর দেহত্যাগ করবো। একদিন নরেন্দ্রনাথ এবং আরো এগারোজন শিক্ষিত চরিত্রবান ও ধার্মিক যুবক পরমহংসদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হলেন। নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।
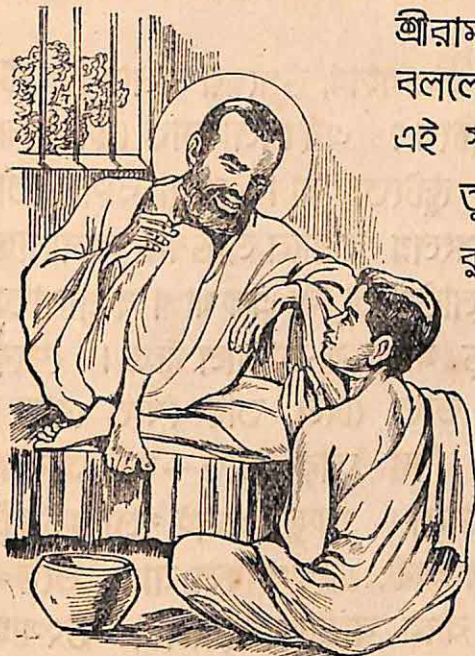
কয়েকদিন পরে ঠাকুর সত্যই দেহরক্ষা করলেন। শিষ্যেরা বিহ্বল হয়ে পড়লো।

নরেন তখন বাড়ী ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছেন, আর সব তরুণ শিষ্যদের নিয়ে

বরাহনগরে একটি বাগান-বাড়ী ভাড়া করে সকলে মিলে সেখানে একটি মঠ করে বাস করতে সুরু করলেন।—

"নীচের তলাটি অব্যবহার্য, উপরের তলায় তিনটি ঘর। কি আর জুটবে? একবেলা ভাত কোনদিন জুটতো, কোনদিন জুটতো না। থালা বাসন তো কিছু নেই, বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে লাউগাছ কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাটতে গেলে উড়ে মালী যা-তা গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হোত। তেলাকুচোর পাতা সিদ্ধ আর ভাত—তা আবার মানকচুর পাতায় ঢালা। কিছু খেলেই গলা কুটকুট করতো। এত যে কষ্ট, ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দুটি-একটি করে বাড়তে লাগলো। উৎসাহ কত? পূজা ধ্যান জপ সর্বক্ষণ চলছে।"

এই ভাবেই সুরু হল মঠ।

ঘর ছাড়া ছেলেরা মঠে গিয়ে উঠেছে,অভিভাবকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ছেলেদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অভিভাবকদের ভয়ে একদিন বালক সারদা (পরে ত্রিগুণাতীত) মঠ ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। বিবেকানন্দের মনে বড় ধাক্কা লাগলো, তিনিও পরিব্রাজকের বেশে মঠ ছেড়ে একদিন বাহির হয়ে পড়লেন।

কাশী, অযোধ্যা ও হৃষিকেশ হয়ে বিবেকানন্দ গেলেন আলমোড়ায়। তার পর পঞ্চনদ, রাজপুতানা, মহীশূর ও মাদ্রাজ হয়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বর। সমগ্র ভারত স্বামীজী পরিব্রাজক হয়ে ভ্রমণ করলেন। বহু জ্ঞানী ও গুণীজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হোল, কত সভায় কত ধর্ম কথার আলোচনা হোল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, পাওহারী বাবা, বাল গঙ্গাধর তিলক, অধ্যাপক সিঙ্গরা ভেলু মুধালিয়র —প্রত্যেকেই স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব দেখে বিস্মিত হলেন।

বৃন্দাবনে স্বামীজী একদিন যমুনায় স্নান করছেন। তীরে তাঁর কাপড়খানি আছে। এমন সময় একটি বানর কোথা থেকে এসে সেই কাপড়খানি নিয়ে চলে গেল, স্বামীজী স্নান করে উঠে কাপড়খানি পেলেন না, আর পরিধেয় কিছুই নেই, নগ্ন হয়ে তো বৃন্দাবনের পথে ঘোরা চলে না। স্বামীজী মনের দুঃখে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন—

স্বামীজী বললেন—এটা তো কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা থুতু ফেলতে দ্বিধা করছেন কেন?

দেওয়ানজী বললেন—আপনি বলেন কি স্বামীজী, মহারাজের ছবিতে আমি কি থুতু ফেলতে পারি?

—ছবি তো আর স্বয়ং মহারাজ নয়, একটুকরো কাগজ মাত্র।

তথাপি সবাই স্তব্ধ।

স্বামীজী বললেন—আপনারা পারবেন না আমি তা জানি। কেন-না এই ছবিতে থুতু ফেলা মহারাজের অসম্মান করা।

তারপর মহারাজের পানে ফিরে বললেন—দেখুন মহারাজ, এখানি ছবি, এতে আপনার অস্তিত্ব আছে! তেমনি মূর্তিগুলিও ভগবানের গুণবাচক মূর্তি, তাতেও ভগবানের অস্তিত্ব আছে। আমরা কখনও বলি না যে 'হে ধাতু, হে প্রস্তর, আমরা তোমার পূজা করছি।' আমরা এগুলিকে ভগবান বলে ধরি।

মহারাজ মুগ্ধ হলেন, স্বামীজীর ভক্ত হয়ে পড়লেন।

জয়পুরে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীর একটি অতি দুরূহ সুত্র অল্পক্ষণের মধ্যে আয়ত্ত করে স্বামীজী সভা-পণ্ডিতকে বিস্মিত করে দেন।

মহীশূরের মহারাজা একদিন স্বামীজীকে বলেন—আমি মহারাজা, আপনি আমার তোষামোদ করবেন, নাহলে জীবন বিপন্ন হবে।

স্বামীজী বলেন—আমি সন্ন্যাসী, আমি জীবনের ভয়ে আপনার অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারি না।

মহারাজার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় দেওয়ান বাহাদুর স্বামীজীর পুঁটলির মধ্যে এক তাড়া

নোট গুঁজে দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামীজী সে টাকা প্রত্যাখ্যান করেন।

এই সময় নানা স্থানে নানা ধর্মসভায় স্বামীজী বেদান্ত মতের এমনসব যুক্তিতর্কের সৃষ্টি করেন যা'তে কেউ তাঁকে এঁটে উঠতে পারেন না—স্বামীজীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু শুধু বড় বড় সভাতেই নয়, চলার পথে

গাঁয়ের সাধারণ মানুষদের মাঝেও তিনি গল্পের ছলে নানা ধর্মকথা বলতেন।

একবার পশ্চিমের কোন এক গাঁয়ের এক গাছ-তলায় বসে তিনি ধর্মকথা বলছিলেন। তাঁর চেহারা ও কথা শুনে সারা গাঁয়ের লোক দলে দলে এসে জড়ো হতে লাগলো তাঁর কাছে।

কথা ফুরায় না, প্রশ্নও ফুরায় না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিনও গেল। সারাদিন ধরে লোক আসে আর যায়, স্বামীজীর কথা বলার আর বিরাম নেই।

তৃতীয় দিন গভীর রাতে দর্শকেরা সকলেই একে একে চলে গেল, একজন মুচি তখনও চুপ করে বসেছিল, সে এবার উঠে এসে স্বামীজীকে প্রণাম করে বললো—বাবা, আজ তিন দিন আপনাকে দেখছি, কিছু খেতে তো আপনাকে দেখি নি?

স্বামীজী বললেন—খাবার তো আমাকে কেউ কিছুই দেয়নি, তুই আমাকে কিছু খাবার দিতে পারিস্?

—আমার বানানো রুটি তরকারী তো আপনাকে খেতে নেই বাবা, আমি যে জাতে মুচি, আমি আটা এনে দিচ্ছি, আপনি বানিয়ে নিন।

—তোর বানানো রুটি তরকারীই আমি খাব, তুই নিয়ে আয়।

মুচি রাজী হয় না, স্বামীজীও ছাড়েন না, বলেন—তোর বানানো হলে খাব, নাহলে খাব না।

শেষে মুচি তার বাড়ী থেকে রুটি তরকারী এনে স্বামীজীকে খাওয়ালেন।

স্বামীজী সংস্কারকে জয় করেছিলেন।

মথুরা থেকে স্বামীজী তখন বৃন্দাবনে চলেছেন, চোখে পড়লো পথের পাশে একটি লোক বসে তামাক খাচ্ছে। তামাক খাওয়াটা স্বামীজীর ছেলেবেলাকার অভ্যাস। মনটা উস্‌খুস্‌ করে উঠলো, দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—কল্‌কেটা একবার দাও তো?

লোকটি বললো—মহারাজ, আমি মেথর!

মেথর শুনেই স্বামীজী পিছিয়ে গেলেন, পরক্ষণেই মনে হোল সন্ন্যাসীর আবার জাতি কি! স্বামীজী মেথরের পাশেই বসে গেলেন ধূমপান করতে।

বোম্বের পথে আবু-রোড ষ্টেশনে স্বামীজী গাড়ীতে উঠে বসেছেন, একজন বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন—এমন সময় চেকার উঠে টিকিট দেখতে চাইল।

স্বামীজী টিকিট দেখালেন। বাঙালী ভদ্রলোক বললেন—তিনি কথা বলতে এসেছেন, গাড়ী ছাড়ার আগেই নেমে যাবেন।

চেকার বললো—রেলের আইন অনুসারে আমি আপনাকে থাকতে দিতে পারি না।

ভদ্রলোক বললেন—আমিও রেলের কর্মচারী, আইন-কানুন আমি ভালই জানি।

চেকার সাহেব, 'কালা আদ্‌মির' এই ধৃষ্টতা সইতে পারে না, ভদ্রলোককে সে নামিয়ে দেবেই। ভদ্রলোকও কিছুতেই নামবেন না। বেধে গেল তর্ক।

স্বামীজী বললেন—ঝগড়া করে কি হবে, থাম।

সাহেব বাংলা জানে না, বললো—তুম্ কাহে বাত করতে হো ?

স্বামীজী ইংরাজীতে বললেন—'তুম' বলছ কাকে ? 'আপ্' বলতে পার না ?

গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীর মুখে ইংরাজী শুনে চেকার বিস্মিত হোল, নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—দুঃখিত, আমি এদেশের ভাষা ভাল জানি না। আপনাকে কিছু বলতে চাই না, এই লোকটির সঙ্গেই আমার কথা হচ্ছিল।

স্বামীজী বললেন—'এই লোকটী' মানে কি ? 'এই ভদ্রলোকটি' বলতে পার না। তুমি আগে বললে হিন্দী ভাষা জান না, এখন দেখছি তুমি তোমার নিজের ভাষাতেও কথা বলতে জান না। কেন তুমি একে 'এই লোকটি' বললে ? তোমার নাম বল, নম্বর দাও ? আমি তোমার উপরওয়ালার কাছে লিখবো।

সাহেবের মুখে আর কথা নেই।

স্বামীজী বললেন—তোমার নাম ও নম্বর দেবার সাহস যদি না থাকে তাহলে মানে মানে সরে পড়।

সাহেব চেকার আর কথাটি না বলে নেমে গেল।

স্বামীজী বলতেন—শিক্ষা ও সভ্যতায় ভারতীয়েরা পৃথিবীর কোন জাতের চাইতেই ছোট নয়। কিন্তু তারা নিজেদের ছোট মনে করে বলেই একটা সামান্য বিদেশীও আমাদের লাথি-ঝাঁটা মারে, আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।

স্বামীজী আবুপর্বতে পথের ধারে একদিন বসে আছেন, এমন সময় এক মৌলবী সাহেবের দৃষ্টি পড়লো তাঁর উপর। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি মৌলবী সাহেবের শ্রদ্ধা ছিল, তিনি স্বামীজীকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। মৌলবী সাহেব ছিলেন কোটা দরবারের উকিল। সেখানে আলাপ-আলোচনার সময় স্বামীজী ইংরাজী জানেন দেখে অনেকে বিস্মিত হলেন।

খেতরীর রাজা-বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সি জগমোহনলাল ইংরাজী-জানা সাধু দেখতে এলেন। কৌপীন-ধারী স্বামীজী একখানি খাটিয়ার উপর শুয়ে ছিলেন। মুন্সিজীকে দেখে উঠে বসলেন। মুন্সিজী বললেন—আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে মুসলমানের বাড়ীতে আছেন? মুসলমানের ছোঁয়া খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেন, এতে তো আপনার ধর্মহানি হতে পারে!

স্বামীজী বললেন—আমি সন্ন্যাসী, আমি যে কোন জাতের যে কোন ধর্মের লোকের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারি। আমি সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মকে দেখি। আমার কাছে ছোটবড় অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই।

মুন্সিজী সাধু-সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করতেন না, সুরু হয়ে গেল আলোচনা। শেষে মুন্সিজী স্বামীজীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ফিরে গিয়ে খেতরীর রাজা মঙ্গল সিংহের কাছে গল্প করলেন। মঙ্গল সিংহ স্বামীজীকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করলেন।

স্বামীজী কয়েকদিন রাজবাড়ীতে রইলেন। রাজা ও মুন্সিজী শেষে স্বামীজীর শিষ্য হলেন।

কথায় কথায় রাজা একদিন বললেন—গুরুদেব, মনে শান্তি নেই, আমার পুত্র-সন্তান নেই!

স্বামীজী আশীর্বাদ করে বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া হলে আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

দীর্ঘ চার বছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে সারা ভারত পরিক্রমা করে স্বামীজী এসে পৌঁছুলেন রামেশ্বরে। ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে এক সন্ধ্যায় সাগরের পানে তাকিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। দুঃখ ও দারিদ্র ক্লিষ্ট দেশবাসীর ছবি তাঁর মনের মাঝে ভেসে উঠলো। স্বামীজী কেঁদে ফেললেন। এতো দুঃখ

এতো গ্লানি কি দূর করা যায় না? বললেন—মা, শক্তি দাও, আমার দেশের এই দুঃখ দৈন্য দূর করার মত শক্তি দাও!

মাতৃভূমির সেবার জন্য, দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় কৌপীনধারী সন্ন্যাসী ভারতের শেষ প্রান্ত থেকে আবার যাত্রা স্থুরু করলেন।

স্বামীজী এলেন মাদ্রাজে।

মুন্সী জগমোহন লাল এসে জানালেন—স্বামীজীর আশীর্বাদে মহারাজের একটি পুত্র হয়েছে, তারই অন্নপ্রাশনে স্বামীজীকে যেতে হবে।

এই সময় আমেরিকার শিকাগো শহরে এক ধর্ম-মহাসভার আয়োজন হচ্ছিল, স্বামীজীর শিষ্যেরা সেখানে স্বামীজীকে পাঠাবার জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। খেতরীর মহারাজা সব ব্যবস্থা করে দিলেন, মুন্সিজী বোম্বাইয়ে স্বামীজীকে জাহাজে তুলে দিলেন।

জাপান হয়ে জাহাজ পৌঁছালো ভঙ্কুভারে। সেখান থেকে রেলপথে স্বামীজী এলেন শিকাগোয়।

পথে নানাভাবে নানা জনে তাঁকে ঠকালো।

শিকাগো পৌঁছে শুনলেন ধর্ম-মহাসভার তখনও তিন মাস বাকী।

এদিকে টাকা প্রায় সব ফুরিয়ে এসেছে!

সহরের চেয়ে গাঁয়ে খরচ কম, স্বামীজী এই তিন মাস গ্রামে কাটাবেন বলেই স্থির করলেন।

স্বামীজী বোষ্টনে গেলেন। পথে রেলগাড়ীতে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে আলাপ হোল, তিনি স্বামীজীর পরিচয় শুনে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

সেখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট সাহেবের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হোল, রাইট সাহেব স্বামীজীকে ধর্ম্ম-সভায় যাবার জন্য একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন, লিখলেন—দেখলাম এই অজ্ঞাত-নামা হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতগুলি একত্র করলে যা হয় তদপেক্ষাও অধিক পণ্ডিত।

পরিচয়-পত্র নিয়ে স্বামীজী এলেন শিকাগোয়।

চিঠিখানি ছিল ব্যারোজ সাহেবের নামে, স্বামীজী ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানা বের করতে পারলেন না। এদিকে শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

স্বামীজী এক হোটেলে গিয়ে উঠলেন।

হোটেলওয়ালা বললেন—এখানে নিগ্রোদের স্থান নেই।

স্বামীজী বললেন—আমি নিগ্রো নয়, ভারতীয়।

—তা নাহয় আমি বুঝলাম, কিন্তু আমার খরিদ্দাররা তো তা বুঝবে না।

স্বামীজী হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন।

পথেও সেই ব্যাপার। যাকেই ব্যারোজ সাহেবের

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজীকে নিগ্রো মনে করে সে-ই কথার জবাব দেয় না !

এদিকে বরফ পড়তে সুরু হোল।

কাঁপতে কাঁপতে স্বামীজী ষ্টেশনে ফিরে এলেন। রেলের মাল গুদামের সামনে একটি বড় প্যাকিং-বাকসের মধ্যে আশ্রয় নিলেন।

শীতের রাত কোন রকমে তো কাটলো। সকালে ক্ষুধায় কাতর হয়ে ভিক্ষায় বেরুলেন।

কিন্তু কেউ ভিক্ষা দিল না।

শ্রান্ত দেহে স্বামীজী শেষে রাস্তায় বসে পড়লেন।

এমন সময় স্বামীজীর গেরুয়া বেশ এক মহিলার

চোখে পড়লো, তিনি স্বামীজীকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। স্বামীজীর পরিচয় শুনে তিনি বললেন —আপনি আগে কিছু খান, তারপর আমিই আপনাকে ধর্ম-সভায় নিয়ে যাব।

শিকাগো ধর্ম-সভা।

পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু বক্তা ও পণ্ডিত সমবেত হয়েছেন। এদেশ থেকেও অনেকে গেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ থেকে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও নগরকর। জৈন-সমাজের পক্ষে বীরচাঁদ গান্ধী। থিওসফি-সোসাইটির পক্ষ থেকে আনি বেশান্ত ও চক্রবর্তী।

"নীচে একটি হল, তাহার পর এক প্রকাণ্ড গ্যালারী, তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ছ'-সাত হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট। আর প্লাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতদের সমাবেশ। আর আমি যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করি নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে!...আমার বুক দুড়দুড় করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল।...সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ। আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম।"

ত্রিশ বছর বয়সের সর্ব-কনিষ্ঠ বক্তা স্বামীজী সবার

শেষে বলতে উঠলেন—আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—!

দু'মিনিট শুধু করতালি-ধ্বনি হোল, এমন কথা আর কেউ বলেননি।

তারপর সুরু হোল বক্তৃতা, সহজ সরল ইংরাজীতে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা। যারা শুনলো তারা বললো—ধন্য সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য!

পরদিনকার কাগজে বড় বড় অক্ষরে বেরুলো—স্বামীজীর নাম আর ছবি।

একদিনে স্বামীজী জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন। স্বামীজীকে একবার দেখবার জন্য তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য হাজার হাজার লোক আসতে লাগলো।

কিন্তু স্বামীজীর এই জনপ্রিয়তা অনেকের সহ্য হোল না, কয়েকজন কথা তুললো—স্বামীজী যে কথা বলেন তা প্রচলিত হিন্দুধর্ম নয়। তাছাড়া স্বামীজী নীচ বংশের লোক, জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত ব্যক্তি, চরিত্রহীন, তাঁকে ধর্মসভা থেকে বের করে দেওয়া হোক্।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অনেকে সমালোচনাও করলেন।

স্বামীজী একদিন বক্তৃতা করতে করতে সহসা থেমে গিয়ে জনতাকে প্রশ্ন করলেন—হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র জানেন এমন কে কে এখানে উপস্থিত আছেন, হাত তুলুন।

সাত হাজার শ্রোতার মধ্যে মাত্র তিন-চারখানি হাত উঠলো। স্বামীজী বললেন—আপনারা যে ধর্মের কিছুই জানেন না, সেই ধর্ম সমালোচনা করার স্পর্ধা আপনারা রাখেন!

স্বামীজীর তিরস্কারে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব সমগ্র আমেরিকাকে বিস্মিত করলো, পথে স্বামীজীর ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হোল—নীচে লিখে দেওয়া হোলঃ ঘূর্ণীঝড়ের মত বেগবান হিন্দু—The Cyclone Hindu.

দু'বছর আমেরিকায় ধর্ম প্রচার করে স্বামীজী এলেন ইউরোপে।

ইংলণ্ডে কুমারী মার্গারেট নোবেলের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হোল। ইনি স্বামীজীর শিষ্যা হয়ে পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা হন। এবং ভারতে এসে এদেশের মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানোর কাজে জীবন উৎসর্গ করেন।

বিলাতে অনেক সময় স্বামীজীকে দুর্মুখ সমালোচকের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হোত।

একবার একজন বললো—ভারতের হিন্দুরা কি করেছে, তারা এ পর্যন্ত একটা জাতিকে জয় করতে পারেনি।

স্বামীজী উত্তর দিলেন—পারে নাই নয়, তারা করে নাই। আর ইহাই হিন্দু জাতির গৌরব যে তারা নররক্তে কখনও ধরিত্রী রঞ্জিত করে নাই। কেন তারা পরদেশ অধিকার করবে? তুচ্ছ ধনের নেশায়? ভগবান চিরদিন ভারতকে দাতার মহিমাময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা জগতের ধর্মগুরু। তাঁরা পরস্বাপহারী রক্ত-পিপাসু দস্যু ছিলেন না। আর সেই কারণেই আমি আমার পিতৃপুরুষের গৌরবে গর্ব অনুভব করে থাকি।

আরেকজন বললো—আপনার পূর্ব-পুরুষ যদি মানব সমাজকে ধর্ম দান করতে এতই ব্যগ্র ছিলেন তাহলে এদেশে এসে ধর্ম প্রচার করেন নি কেন?

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—তখন তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ বন্য বর্বর ছিলেন। সবুজবর্ণ বৃক্ষপত্র-রসে উলঙ্গ দেহ রঞ্জিত করে গিরিগুহায় বাস করতেন। তাঁরা কি অরণ্যে ধর্ম প্রচার করবেন?

একজন বললেন—স্বামীজী আপনি খৃষ্টান নন, খৃষ্ট-ধর্মের আদর্শ বুঝবেন কি করে?

স্বামীজী বললেন—খৃষ্ট প্রাচ্য-দেশীয় এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, আমিও প্রাচ্য-দেশীয়

সন্ন্যাসী। আমার মনে হয় পাশ্চাত্য জগৎ এখনও তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্যকরূপে বুঝতে পারেনি। তিনি কি বলেননি—"যাও তোমার সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আইস, তারপর আমার অনুসরণ কর।" তোমাদের দেশের ক'জন বিলাসী ধনী সর্বত্যাগী হয়ে এসেছেন ?

অক্‌স্‌ফোর্ডে বিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমুলারের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। পণ্ডিত মোক্ষমুলার স্বামীজীকে বিদায় দেবার জন্য বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ষ্টেশনে আসেন। স্বামীজী বলেন—আপনি বুড়ো মানুষ এই শীতে বৃষ্টিতে ভিজে কেন ষ্টেশনে এলেন ?

মোক্ষমুলার স্বামীজীর হাত ধরে বললেন—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যকে তো রোজ রোজ দেখতে পাব না।

ইংলণ্ড থেকে স্বামীজী গেলেন ইউরোপে।

জেনেভায় তিনি বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়েন।

জার্মানীতে বেদান্ত-পণ্ডিত পল-ডয়সনের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়।

একদিন সকালবেলা অধ্যাপক ডয়সনের বাড়ীতে স্বামীজী বসে আছেন। কথায় কথায় কি একটা কাজে অধ্যাপক কিছুক্ষণের জন্য উঠে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। টেবিলের উপর একখানি বই

একবার একজন বললো—ভারতের হিন্দুরা কি করেছে, তারা এ পর্যন্ত একটা জাতিকে জয় করতে পারেনি।

স্বামীজী উত্তর দিলেন—পারে নাই নয়, তারা করে নাই। আর ইহাই হিন্দু জাতির গৌরব যে তারা নররক্তে কখনও ধরিত্রী রঞ্জিত করে নাই। কেন তারা পরদেশ অধিকার করবে ? তুচ্ছ ধনের নেশায় ? ভগবান চিরদিন ভারতকে দাতার মহিমাময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা জগতের ধর্মগুরু। তাঁরা পরস্বাপহারী রক্ত-পিপাসু দস্যু ছিলেন না। আর সেই কারণেই আমি আমার পিতৃপুরুষের গৌরবে গর্ব অনুভব করে থাকি।

আরেকজন বললো—আপনার পূর্ব-পুরুষ যদি মানব সমাজকে ধর্ম দান করতে এতই ব্যগ্র ছিলেন তাহলে এদেশে এসে ধর্ম প্রচার করেন নি কেন ?

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—তখন তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ বন্য বর্বর ছিলেন। সবুজবর্ণ বৃক্ষপত্র-রসে উলঙ্গ দেহ রঞ্জিত করে গিরিগুহায় বাস করতেন। তাঁরা কি অরণ্যে ধর্ম প্রচার করবেন ?

একজন বললেন—স্বামীজী আপনি খৃষ্টান নন, খৃষ্ট-ধর্মের আদর্শ বুঝবেন কি করে ?

স্বামীজী বললেন—খৃষ্ট প্রাচ্য-দেশীয় এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, আমিও প্রাচ্য-দেশীয়

সন্ন্যাসী। আমার মনে হয় পাশ্চাত্য জগৎ এখনও তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্যকরূপে বুঝতে পারেনি। তিনি কি বলেননি—"যাও তোমার সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আইস, তারপর আমার অনুসরণ কর।" তোমাদের দেশের ক'জন বিলাসী ধনী সর্বত্যাগী হয়ে এসেছেন ?

অক্স্ফোর্ডে বিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমুলারের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। পণ্ডিত মোক্ষমুলার স্বামীজীকে বিদায় দেবার জন্য বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ষ্টেশনে আসেন। স্বামীজী বলেন—আপনি বুড়ো মানুষ এই শীতে বৃষ্টিতে ভিজে কেন ষ্টেশনে এলেন ?

মোক্ষমুলার স্বামীজীর হাত ধরে বললেন—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যকে তো রোজ রোজ দেখতে পাব না।

ইংলণ্ড থেকে স্বামীজী গেলেন ইউরোপে।

জেনেভায় তিনি বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়েন।

জার্মানীতে বেদান্ত-পণ্ডিত পল-ডয়সনের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়।

একদিন সকালবেলা অধ্যাপক ডয়সনের বাড়ীতে স্বামীজী বসে আছেন। কথায় কথায় কি একটা কাজে অধ্যাপক কিছুক্ষণের জন্য উঠে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। টেবিলের উপর একখানি বই

পড়েছিল, স্বামীজী বইখানির পাতা ওলটাতে সুরু করলেন।

অধ্যাপক ফিরে এলেন। তিনি স্বামীজীকে ডাকলেন, কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না।

ঘণ্টাখানেক পরে স্বামীজী বই থেকে মুখ তুললেন, অধ্যাপককে বসে থাকতে দেখে বললেন—আপনি অনেকক্ষণ বসে আছেন, আমি বই পড়ছিলাম, তাই টের পাইনি, ক্ষমা করবেন।

অধ্যাপক বললেন—আপনি তো বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন, পড়লেন কখন?
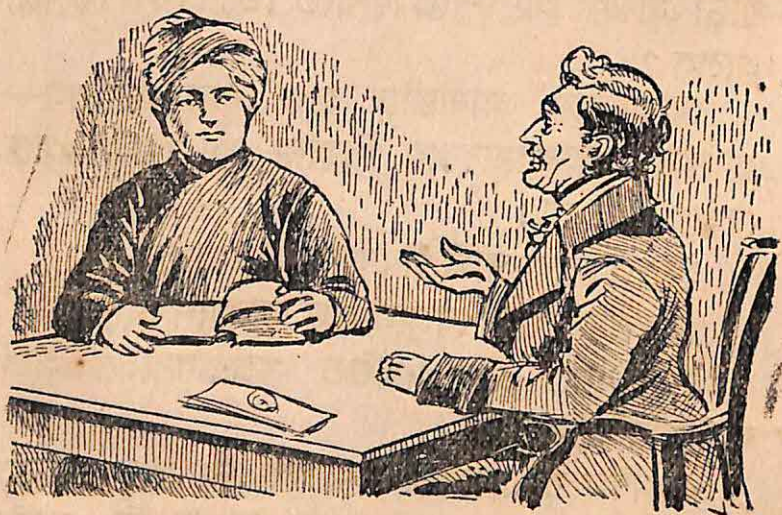
স্বামীজী হেসে বললেন—বইখানি পড়েছি কি না আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বইয়ের যে-

কোন পৃষ্ঠা থেকে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

অধ্যাপক বইখানি তুলে নিলেন, বইয়ের নানা জায়গা থেকে স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন, স্বামীজী অনর্গল বইয়ের কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে লাগলেন।

অধ্যাপক বিস্মিত হলেন, বললেন—চারশো পৃষ্ঠার একখানি বই আপনি এভাবে মুখস্ত করলেন কি করে?

স্বামীজী হেসে বললেন—সংযত-মনা যোগীর পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করলে এইরূপ স্মৃতিশক্তি লাভ করা যায়।

স্মৃতি-শক্তির কথা অধ্যাপক শাস্ত্রে পড়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেননি, এবার চোখে দেখে তাঁর ভুল ভাঙলো।

চার বছর বিদেশে কাটিয়ে স্বামীজী স্বদেশ যাত্রা করলেন। বিলাতে এক বন্ধু স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—চার বছর পাশ্চাত্য দেশে কাটাবার পর আপনার মাতৃভূমি এখন কেমন লাগবে?

স্বামীজী বললেন—এদেশে আসার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার

কাছে পবিত্রতা মাখা,—ভারত এখন আমার কাছে তীর্থস্বরূপ।

জাহাজে দু'জন বৃটিশ পাদরী ছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে চিনতেন না। প্রতিদিন তাঁদের চোখে পড়ে স্বামীজীর চারিপাশে সাহেবরা বসে বসে গল্প শোনে, সম্মান করে। শাদা লোকেরা একজন কালো লোককে সম্মান করে, দেখে পাদরী দু'জন মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। একদিন স্বামীজীকে একা ডেকের উপর পেয়ে তারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা রকম নিন্দা করলো।

স্বামীজী সহসা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—যা জান না তা নিয়ে কথা বলতে আস কেন?

পাদরী দু'জন তবু গালাগালি দিতে লাগলো।

স্বামীজী বললেন—কেন মিছামিছি গাল দিচ্ছ, আমার সঙ্গে বিচার কর। আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কথার কোন দাম নেই। তোমরা জান না বলেই ওরকম বলছ। সব জানলে তোমরা ভারতকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হবে।

তবুও গালাগালি।

স্বামীজী এবার এগিয়ে গিয়ে একজনের কলার চেপে ধরলেন, বললেন—আর একটি কথা বলেছ কি তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।

এবার কাজ হোল, পাদরী বললেন—আমায় মাপ করুন, আর আমি কখনও এরকম করবো না।

স্বামীজী এবার তাকে ছেড়ে দিলেন।

স্বামীজী এসে পৌঁছলেন সিংহলে।

সেখান থেকে এলেন ভারতে।

সমুদ্রতীরে রামনাদের রাজা স্বামীজীর শিষ্য ভাস্কর বর্মা সেতুপতি অপেক্ষা করছিলেন, পিছনে ছিল হাজার হাজার লোকের জনতা। স্বামীজী মাটিতে নামামাত্র সকলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম জানালেন।
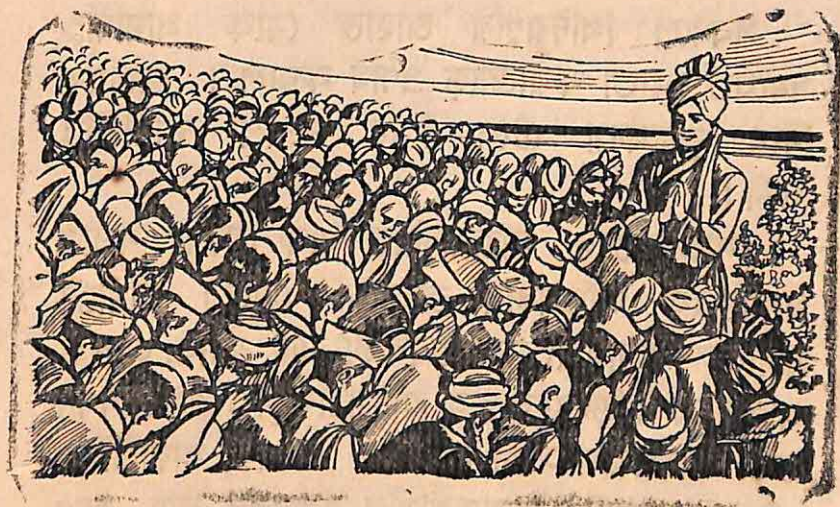
তারপর স্বামীজীকে একখানি গাড়ীতে বসিয়ে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন।

স্বামীজী রাজ-প্রাসাদের তোরণে পৌঁছানো মাত্র তোপধ্বনি হোল।

স্বামীজী যেখানে প্রথম পদার্পণ করেন রামনাদের রাজা সেখানে চল্লিশ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ তৈরী করে দেন।

মাদ্রাজে যখন স্বামীজী পৌঁছলেন, হাজার হাজার দর্শক জয়ধ্বনি জানালো। যুবকেরা রাজপথের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো তাঁর গাড়ী। রাজপথে পুরনারীরা স্বামীজীকে পুষ্প-চন্দনে পূজা করলেন।

তারপর কলিকাতা।

সকালে খিদিরপুরে জাহাজ থেকে নামামাত্র সমবেত জনতা করজোড়ে প্রণাম করলো। রাজপথ দিয়ে যুবকেরা টেনে নিয়ে চললো স্বামীজীর গাড়ী।

শোভাবাজার রাজবাড়ীতে এক বিরাট সভায় স্বামীজীকে অভিনন্দন জানানো হোল। স্বামীজী বললেন—আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ ও অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর—যারা দিন দিন ডুবছে।

বলরাম বসুর বাড়ীতে কয়েকজন চরিত্রবান যুবককে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই সমিতিতে স্বামীজী বললেন—তোমাদের পরের জন্য প্রাণ দিতে হবে, বিধবা পুত্রহীনার চোখের জল মুছাতে হবে, নিরক্ষর গরীবেরা যাতে দু'পয়সা রোজগার করে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করতে পারে তার উপায় দেখতে হবে, কেউ যদি অন্যায় ভাবে কারও উপর অত্যাচার করে তা হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে, সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে হবে।—এই তো সন্ন্যাসীর কাজ।

বিবেকানন্দ এই সমিতিতে একদিন নিজের সম্পর্কে বলেন—আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই, যারা নিজেদের ভক্তি মুক্তি কামনা ত্যাগ করে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে—আমি তাদের চেলা—তাদের ভৃত্য—ক্রীতদাস।

স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ায় স্বামীজী এলেন আলমোড়ায়। সেখানে স্বামীজীর অভ্যর্থনা করার জন্য বিপুল আয়োজন হয়েছে। সহসা স্বামীজীর চোখে পড়লো এক ফকির একপাশে দাঁড়িয়ে জনতার সমারোহ দেখছে। ফকিরের মুখের পানে তাকিয়েই

স্বামীজী তাকে চিনতে পারলেন, ফকিরকে ডাকলেন নিজের কাছে।

ফকির তো অবাক! স্বামিজী বললেন—পাঁচ বছর আগে, যখন আমি একজন সাধারণ পরিব্রাজক হয়ে ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন একবার এই আলমোড়ার পথে কয়েক দিন আমায় শুধু জল খেয়ে থাকতে হয়েছিল। শেষে একদিন আর চলতে না পেরে পথের ধারে শুয়ে পড়েছিলাম, সেই সময় তুমি চলেছিলে সেই পথ দিয়ে। আমার অবস্থা দেখে তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে একটি শশা এনে দাও। সেই শশাটি খেয়ে আমি অনেকটা সুস্থ হই, ও আবার চলার মত শক্তি পাই।

ফকিরের চোখে জল এসে পড়লো, সামান্য একটী শশার কথা এত বড় মানুষ কি এমন ভাবে মনে রাখতে পারে!

সমবেত জনতাও বোধ হয় স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের একটা নূতন দিক সেদিন দেখতে পেয়েছিল।

কিছুদিন আলমোড়ায় থেকে কাশ্মীর, কাশ্মীর থেকে রাজপুতানা।

আলোয়াড়ে রাজ-আতিথ্য ছেড়ে স্বামীজী এক গরীবের গৃহে উঠলেন। এই গৃহের গৃহস্বামিনী একদিন অখ্যাত পরিব্রাজক স্বামীজীকে নিজ গৃহে আশ্রয়

ও আহার দিয়েছিলেন। এখন বিশ্ববিখ্যাত স্বামীজীকে সেই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে দেখে মহিলা তো কেঁদে ফেললেন, এতো খ্যাতিমান লোক কি এমন করে গরীবকে মনে রাখে।

স্বামীজীকে খেতে দিয়ে মহিলা বললেন—বাবা, আমি গরীব, আপনাকে দেবার মত মিষ্টি কোথায় পাব?

স্বামীজী বললেন—মা, তোমার এই চাপাটিই বড় মিষ্টি, এমন আমি কখনও খাইনি।

আসার সময় স্বামীজী সেই বাড়ীর একজন পুরুষের হাতে একশো টাকার একখানি নোট দিয়ে এলেন।

খেতরীর এক সভায় স্বামিজী বললেন—আমরা হিন্দুও নই, বৈদান্তিকও নই, আমরা ছুঁৎমার্গীয় দল। রান্নাঘর হোল আমাদের মন্দির, ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা, আর 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা' মন্ত্র। সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার সত্বর দূর করতে হবে।

স্বামীজী কলকাতায় ফিরলেন।

মিস্ হেন্‌রিয়েটা মুলার টাকা দিলেন, বেলুড়ে গঙ্গার ধারে জমি কেনা হোল। লণ্ডনের শিষ্যেরা টাকা দিলেন জমি সমতল করতে। ঠাকুর-ঘর তৈরী করা ও মঠের খরচ চালানোর টাকা দিলেন মিসেস ওলিবুল। বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা হোল।

সেবার ঠাকুরের জন্মতিথিতে স্বামীজী প্রায় পঞ্চাশ জন শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার করলেন, স্বামীজী বললেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জনেরই উপনয়ন সংস্কার আছে।

স্বামীজীর স্বাস্থ্য খারাপ হোল, ডাক্তাররা আবার তাঁকে পাঠালেন দার্জিলিঙে।

কিন্তু সেখানে স্বামীজী থাকতে পারলেন না, কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিল। স্বামীজী কলিকাতায় এসে রোগীর সেবায় লেগে গেলেন। এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন—স্বামীজী, টাকা কোথায় পাওয়া যাবে ?

স্বামীজী বললেন—কেন, যদি প্রয়োজন হয় মঠের জমি বিক্রী করবো। হাজার হাজার লোক আমাদের চোখের সামনে যন্ত্রণা ভোগ করবে আর আমরা মঠে বাস করবো। আমরা সন্ন্যাসী, আমরা না হয় আগের মত গাছতলায় বাস করবো আর ভিক্ষা করে খাব !

কিন্তু টাকার অভাব হোল না, চারিদিক থেকে টাকা এসে পড়তে লাগলো। স্বামীজী শিষ্যদের বললেন—দেখলি, তোরা যে কেবল টাকার ভাবনা করিস্ ? ওরে সৎকাজে কোনদিন টাকার অভাব হয় না। যদি তোরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবায় লেগে যাস, তাহলে দেশের লোক আনন্দের সঙ্গে তোদের টাকা দেবে।

এই সময় স্বামীজী একদিন হিতবাদীর সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্করকে বলেন—যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু অধর্ম।

শিষ্যদের ডেকে বললেন—লেগে যা—ক'দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্ তখন একটা দাগ রেখে যা। তোদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে সেই শক্তি জাগিয়ে তোল্। যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরে যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে—মরছে তা'তে জগতের কি আসছে, যাচ্ছে। একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। লেগে যা, লেগে যা—দেরী করিস নে, মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে আর পরে করবি বলে বসে থাকিস্ নি, তাহলে কিছু হবে না!

দেশের শিক্ষিত যুবকদের একদিন বললেন—আগামী পঞ্চাশ বৎসর, একমাত্র জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য ইষ্টদেবতা, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয় বর্ষ ভুললেও কোন ক্ষতি নেই। তোমরা কেন নিষ্কর্মা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হচ্ছে? তোমার সম্মুখে তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখছ, সেই বিরাটের উপাসনা করতে

পারছ না? এই সব মানুষ, এই সব পশু, এরাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশ-বাসীরাই তোমার প্রথম উপাস্য।

স্বামীজীর হাঁপানী দেখা দিল। কয়েক দিন দেওঘরে থেকে সুস্থ হয়ে স্বামীজী আবার একদিন বেরিয়ে পড়লেন আমেরিকার উদ্দেশে।

জাহাজে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে একদিন বললেন—দেখ, যতই দিন যাচ্ছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করছি, মনুষ্যত্ব লাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই অভিনব বার্তাই আমিই জগতে প্রচার করছি। যদি অন্যায় কাজ করতে হয়, তবে তাও মানুষের মত কর, যদি দুষ্টই হতে হয়, তবে বড় রকমের একটা দুষ্ট হও।

আমেরিকায় সানফ্রানসিস্কোর মিস বুক একশো ষাট একর জমি দিলেন, একটি মঠ স্থাপনের জন্য।

প্যারিসের মহামেলায় যাবার জন্য স্বামীজীর নিমন্ত্রণ হোল। জাহাজে আসার পথেই স্বামীজী ফরাসী ভাষা শিখে নিলেন।

প্যারিসে বিশ্বের গুণীজন সম্মেলন হয়েছিল। তাঁরা স্বামীজীর পাণ্ডিত্য দেখে বিস্মিত হন। এখানে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়।

তারপর ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া,

বুলগেরিয়া, তুরস্ক, গ্রীস ও মিশর হয়ে স্বামীজী দেশে ফিরলেন।

বোম্বাই থেকে কলিকাতার পথে স্বামীজী সাহেব সাজলেন। সাহেব এসে নামলেন হাওড়ায়। হাওড়া থেকে বরাবর বেলুড়ে।

মঠের কেউই জানে না যে স্বামীজী ফিরে আসছেন। রাত্রে সকলে খেতে বসেছেন এমন সময় মালী এসে জানালো—এক সাহেব এসেছেন।

একজন সন্ন্যাসী ফটক খুলে দিতে এলেন। ফটক খুলে দেখেন বাইরে কেউই নেই।

এদিকে সাহেব বরাবর খাবার ঘরের সামনে এসে

দাঁড়ালেন। টুপী মাথায় সাহেবকে অন্ধকারে ভালো ভাবে ঠাহর করা যায় না। স্বামী প্রেমানন্দজী আলো নিয়ে এসে দেখেন সাহেব আর কেউ নন্, স্বয়ং স্বামীজী।

স্বামীজী হেসে বললেন—বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে যদি তাড়াতাড়ি না যাই তাহলে রাত্রে খেতে পাব না, তাই পাঁচিল টপ্‌কে চলে এলাম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও!

সন্ন্যাসীদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। তখনই সকলের সঙ্গে স্বামীজী খিচুড়ী খেতে বসে গেলেন।

বেলুড় মঠ তখন তৈরী হচ্ছে।

সাঁওতালরা মাটি কাটছে, জঙ্গল সাফ করছে।

স্বামীজী এই সরল মানুষগুলিকে অত্যন্ত ভাল-বাসতেন, বসে বসে তাদের সঙ্গে কত গল্প করতেন।

কেষ্টা নামে এক সাঁওতাল তাঁকে মাঝে মাঝে বলতো—স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানে আসিস্ না। তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায় আর বুড়ো বাবা এসে বকে।

স্বামীজী বলতেন—না না, বুড়োবাবা বকবে না। তুই তোদের দুটো কথা বল।

স্বামীজী বসে বসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন।
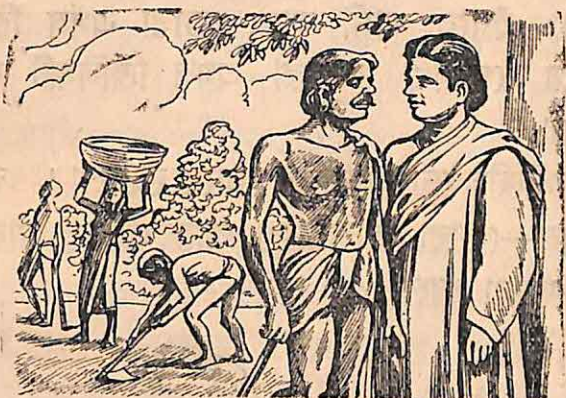
একদিন এই সাঁওতালদের সঙ্গে স্বামীজী গল্প করছেন, এমন সময় খবর এলো কলিকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বার বার স্বামীজীকে বলে পাঠানো হোল, কিন্তু সাঁওতালদের ফেলে স্বামীজী ভদ্র-লোকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন না।

একদিন স্বামীজীর ইচ্ছা হোল এই সাঁওতাল-গুলিকে পরিতোষ করে আহার করাবেন। বললেন —ওরে, তোরা আজ আমাদের এখানে খাবি।

কেষ্টা বললো—তোদের ছোঁয়া নুন খেলে আমাদের যে জাত যাবে বাপ্‌!

স্বামীজী বললেন—নুন খাবি কেন? নুন না দিয়েই তরকারী রেঁধে দেব।

লুচি, তরকারী ও নানারকম মিষ্টি তৈরী করিয়ে স্বামীজী তাদের খাওয়ালেন। খেতে খেতে তারা বললো—হ্যাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিষটি কোথায় পেলি? আমরা এমন জিনিষটি কখনও খাইনি।

স্বামীজীর চোখ ছল ছল করে উঠলো। স্বামীজী বললেন—তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হোল।

স্বামীজী গেলেন পূর্ববঙ্গে।

সাধু নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে তিনি অতিথি

হলেন। নাগ মহাশয়ের বিধবা পত্নী বিদায়কালে স্বামীজীকে একখানি কাপড় দিলেন।

স্বামীজী রাজা-মহারাজার বহু-মূল্য উপহার কখনও গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ধর্মপ্রাণ বিধবার দেওয়া এই কাপড়খানি শ্রদ্ধা সহকারে মাথায় জড়িয়ে নিলেন।

ঢাকায় স্বামীজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

শরীর সারাবার জন্য গেলেন শিলং।

সেখানে একদিন অবস্থা বড়ই খারাপ হোল, শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। এক তরুণ ব্রহ্মচারী স্বামীজীর সেবা করছিলেন। স্বামীজীর কষ্ট দেখে ব্রহ্মচারী মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন—হে ভগবান, দয়া করে এই রোগ ও কষ্ট আমাকে দাও, স্বামীজী সুস্থ হোন্!

স্বামীজী তার মুখের পানে তাকিয়ে বোধ হয় মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন, বললেন—আমি তো সংসারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার জন্যই জন্মেছি, তুমি অধীর হয়ো না।

দুর্যোগ কেটে গেল, কিছুটা সুস্থ হয়ে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরলেন।

চিকিৎসকেরা স্বামীজীকে বেশী কথা বলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু ছাত্রেরা এলেই স্বামীজী তাদের কাছে সেবা-ধর্মের কথা বলতেন, তখন কেউ ডাক্তারের উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিলে স্বামীজী

বলতেন—এদের মধ্যে একজনও যদি আদর্শ জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক। পর-কল্যাণে হলই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়?

স্বামীজী মঠে কয়েকটি গাই, ছাগল, কুকুর, হরিণ ও হাঁস পুষেছিলেন। তাদের সঙ্গে তিনি খেলা করতেন, ছুটোছুটি করতেন, তাদের সঙ্গে কত কথা বলতেন।

একটি ছাগলের তিনি দুধ খেতেন, তার নাম দিয়েছিলেন—হংসী।

একটি ছাগল-ছানার নাম দিয়েছিলেন—মটরু। তার গলায় ঘুঙুর পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে তিনি খেলা করতেন।

মটরুটা হঠাৎ একদিন মরে গেল, স্বামীজী দুঃখ করে বললেন—আমি যেটাকে বেশী করে ভাল-বাসবো, সেটাই মরে যাবে!

একটা কুকুর ছিল, তার নাম দিয়েছিলেন—বাঘা। এই বাঘা স্বামীজীর সব পশু-পাখীকে পাহারা দিত। একদিন বাঘা কি-একটা অন্যায় করে ফেলে, স্বামীজী বললেন—ওটাকে গঙ্গার ওপারে নিয়ে গিয়ে রেখে এস। আর আসতে পারবে না।

বাঘাকে গঙ্গার ওপারে নিয়ে গিয়ে রেখে আসা

হোল। বাঘা অনেক ডাকাডাকি করলো কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিল না।

শেষে বাঘা একখানি খেয়া নৌকায় উঠে বসলো। মাঝিরা বাঁশ নিয়ে তাড়া করলো, বাঘা কিন্তু কিছুতেই নামলো না, গর্জাতে লাগলো। নৌকার লোকেরা বললো—থাক গে, ওপারে যেতে চায় যাক্!

বাঘা এপারে এসে লুকিয়ে রইল।

পরদিন প্রত্যুষে স্বামীজী বাথ্‌রুমে যাচ্ছেন, পায়ে যেন কি ঠেকলো, দেখেন বাঘা। বাঘার চোখে জল।

স্বামীজী তখনই বাঘার সব দোষ ভুলে গেলেন, পিঠ চাপড়ে বাঘাকে আদর করলেন।

কয়েকদিনের জন্য স্বামীজী দু'জন জাপানী বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে এলেন বুদ্ধগয়া ও কাশী।

তারপর পূর্ণোদ্যমে লেগে গেলেন মঠের কাজে।

৪ঠা জুলাই সকাল-বেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে স্বামীজী প্রায় তিন ঘণ্টা একান্তে ধ্যান করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গান গাইতে গাইতে—মন চল নিজ নিকেতনে।

কিছুক্ষণ পরে প্রেমানন্দজী শুনলেন স্বামীজী আপন মনেই বলছেন—যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকতো, তাহলে সে বুঝতো বিবেকানন্দ

কি করেছে। কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে।

দুপুরে স্বামীজী সকলের সঙ্গে আহার করলেন, তারপর ঘণ্টা তিনেক ব্রহ্মচারীদের ব্যাকরণ পড়ালেন। তারপর বেরুলেন বেড়াতে।

সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় নিজ শয়ন ঘরে গিয়ে তিনি ধ্যানে বসলেন। পূর্বদিকের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন গঙ্গা ও দক্ষিণেশ্বরের দিকে। তারপর জপমালা হাতে নিয়ে ধ্যানে বসলেন, সঙ্গের ব্রহ্মচারীকে বললেন—তুমি ঘরের বাইরে বসে ধ্যান কর।

ধ্যান শেষ হোল রাত ন'টায়। মাটিতে মাদুর পেতে স্বামীজী শয়ন করলেন, ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন—বাতাস কর।

শুয়ে শুয়ে স্বামীজী জপ করছিলেন। হঠাৎ হাতটা একটু কেঁপে জপ থেমে গেল, ঘুমন্ত শিশুর মত স্বামীজী একটু কেঁদে উঠলেন, মাথাটি গড়িয়ে পড়ল বালিশের উপর থেকে।

বালক ব্রহ্মচারী ছুটে গিয়ে সবাইকে খবর দিল, সকলে ছুটে এসে দেখেন—সব শেষ হয়ে গেছে।

স্বামীজীর বয়স তখন মাত্র ঊনচল্লিশ বছর।

স্বামীজীর বাণী ঃ

সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে।

* * * *

কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরখ করিতে হইলে দেখিতে হইবে সে ব্যক্তি কত দূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্মিক।

* * * *

যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকে ধাবমান, তাহারা আপাতত যতই তেজস্বী ও বীর্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

* * * *

তুমি যে কোন জাতি হও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—তবে তাই বলিয়া তুমি অপর জাতীয় কাহাকেও ঘৃণা করিতে পার না।

* * * *

আমাদের আবশ্যক—লৌহ ও বজ্রদৃঢ় পেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেক দিন ধরিয়া

কাঁদিয়াছি। এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহাতে আমাদের মানুষ করিতে পারে।

* * * *

কাহারও উপর প্রভুত্ব করিয়া কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও!

* * * *

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন, কে কোথায় দেখিয়াছে—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।

* * * *

কোন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ? তুমি কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে তোমার তাঁহার নাম প্রচারে কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে ঘুরিতেছ,—আবার আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ? অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় আমরা

উভয়েই যে খানায় পড়িয়া যাইব! অতএব অপরের সহিত বিবাদ করিবার পূর্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইও।”

* * * *

অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হয় না। অনুকরণ কখনও উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন।

* * * *

অপরের নিকট ভাল যাহা পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্রত্ব হারাইও না।

* * * *

সকল অসৎকার্যের মূল—দুর্বলতার জন্যই মানুষ যাহা করা উচিত নয় তাহা করিয়া থাকে।

* * * *

হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা ধনী ও বড়লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না, দরিদ্রেরাই জগতে চিরকাল মহান বিরাট কার্য সমূহ সাধন করিয়াছে! হে দরিদ্র

বঙ্গবাসীগণ, উঠ, তোমরা সব করিতে পার আর তোমাদিগকে সব করিতেই হইবে। দৃঢ় চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়।

* * * *

আমাদের সকল কার্য—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সকলগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্টি করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি। তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি?

* * * *

তোমাদিগকে গভীর ধ্যান ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমূহূর্তে যাইয়া এই মাঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পর মূহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে খুব সামান্য কায

—যেমন পাইখানা সাফ—পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—শুধু এখানে নহে অন্যত্রও।

* * * *

ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

* * * *

চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না, প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পূর্ণ হয়।

* * *

তোমাদের পরের জন্য প্রাণ দিতে হবে, বিধবা পুত্রহীনার চোখের জল মুছাতে হবে, নিরক্ষর গরীবেরা যাতে দু'পয়সা রোজগার করে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করতে পারে তার উপায় দেখতে হবে, কেউ যদি অন্যায় ভাবে কারও উপর

অত্যাচার করে তা হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে, সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে হবে।—এই তো সন্ন্যাসীর কাজ।

* * * *

আমরা হিন্দুও নই, বৈদান্তিকও নই, আমরা ছুঁৎ-মার্গীয় দল। রান্নাঘর হোল আমাদের মন্দির, ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা, আর 'ছুঁয়োনা' 'ছুঁয়োনা' মন্ত্র। সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার সত্বর দূর করতে হবে।

* * * *

ওরে, সৎকাজে কোনদিন টাকার অভাব হয় না। যদি তোরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবায় লেগে যাস, তাহলে দেশের লোক আনন্দের সঙ্গে তোদের টাকা দেবে।

* * * *

যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু অধর্ম।

* * * *

লেগে যা—ক'দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্ তখন একটা দাগ রেখে যা। তোদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে সেই শক্তি জাগিয়ে তোল্। যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে দুঃখ হয়েছে, যেখানে

দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরে যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে—মরছে, তা'তে জগতের কি আসছে যাচ্ছে। একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। লেগে যা, লেগে যা—দেরী করিস নে, মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে আর পরে করবি বলে বসে থাকিস্ নি, তাহলে কিছু হবে না!

* * * *

আগামী পঞ্চাশ বৎসর, একমাত্র জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য ইষ্টদেবতা, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয় বর্ষ ভুললেও কোন ক্ষতি নেই। তোমরা কেন নিষ্কর্মা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হচ্ছ? তোমার সম্মুখে তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখছ, সেই বিরাটের উপাসনা করতে পারছ না? এই সব মানুষ, এই সব পশু, এরাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশ-বাসীরাই তোমার প্রথম উপাস্য।

* * * *

এদেশে গরীব দুঃখীদের দিকে কারো নজর নেই। তারাই তো দেশের সমাজের মেরুদণ্ড। অথচ তাদেরই আমরা রেখেছি অচ্ছুৎ করে। এক এক সময় ইচ্ছে হয়, সমাজ থেকে এই ছুঁৎমার্গের সব বাঁধন ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিই আর মুচি, মেথর, চাঁড়াল, বামুন, কায়স্থ সকলকে আলিঙ্গন করে বলি, আয় তোরা

দূরে দূরে থাকিস্‌নি, আজ আমরা সবাই ভাই। এরা না জাগলে দেশ যে সত্যিভাবে জাগবে না।

* * * *

যদি ভাল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টা গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানব দেহধারী হরেক মানুষের পূজা কর গে। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুর-ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, ত এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন। এদিকে জেন্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। তোরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়,—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার কর।

* * * *

বাহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

* * * *

তুমি যাহা চিন্তা করিবে তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্বল ভাব তবে তুমি দুর্বল হইবে ; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব তবে তুমি অপবিত্র। আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে।

* * * *

স্বামীজীর জীবন-পঞ্জী ঃ

১৮৬৩—১২ জানুয়ারী সকাল ৬৷৩৩ মিঃ—জন্ম—কলিকাতা

” ৭৯—প্রবেশিকা পরীক্ষা

” ৮১—নভেম্বর—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দেখা

” ৮৪—পিতার মৃত্যু

” ৮৬—১৬ আগষ্ট—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ

” ৮৮–৯৩—ভারত পরিভ্রমণ

” ৯৩—৩১ মে—আমেরিকা যাত্রা

১১ সেপ্টেম্বর—ধর্মমহাসভার প্রারম্ভিক অধিবেশন

২৭ সেপ্টেম্বর—মহাসভার অধিবেশন শেষ

” ৯৫—ইংলণ্ড যাত্রা প্রথম বার

” ৯৬—ইংলণ্ডে দ্বিতীয় বার

” ৯৭—জানুয়ারী—সিংহল—ভারতে প্রত্যাবর্তন

সেপ্টেম্বর—কাশ্মীর—অমরনাথ

” ৯৭—রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

” ৯৮—ডিসেম্বর—বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা

” ৯৯—উদ্বোধন প্রকাশ (১ মাঘ ১৩০৫)

২০ জুন—ইংলণ্ড যাত্রা

৩১ জুলাই—লণ্ডন—তৃতীয় বার

১৫ অক্টোবর—নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতি প্রতিষ্ঠা

১০ নভেম্বর—মার্কিন জনসাধারণের অভিনন্দন

১৯০০—অক্টোবর—প্যারিস মহামেলা—ইউরোপ ভ্রমণ

৯ ডিসেম্বর—ভারতে প্রত্যাবর্তন

" ০১—১৮ মার্চ—পূর্ববঙ্গে গমন

—বেলুড়মঠে দুর্গোৎসব

ডিসেম্বর—কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন ও নেতাদের স্বামীজীর সহিত দেখা

" ০২—জানুয়ারী—বুদ্ধগয়া— কাশীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা

৪ জুলাই—রাত্রে দেহত্যাগ—বেলুড়